যারা দেখাল নতুন আলো

শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

যারা দেখাল নতুন আলো

[বিজ্ঞানীদের জীবন]

শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৭

মূল্য ঃ পঁচিশ নয়া পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষা-অধিকারের পক্ষে, প্রচার-অধিকর্তা শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর কর্তৃক
প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

শিশু এবং সদ্যসাক্ষর পাঠকের উপযোগী সাহিত্য রচনা সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনার একটি বিশেষ অঙ্গ। ঐরূপ সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক সাহিত্য-কর্মশালা আয়োজিত ও পরিচালিত হইতেছে। কোন বিশেষ সাহিত্য-ব্রতীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন নির্বাচিত লেখক লইয়া সাহিত্য কর্মশালা সংগঠিত হয়। নতুন আঙ্গিকে এবং বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে লেখকগণ নানা বিষয়ে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। দেড়মাস কাল তাঁহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিয়া রচনার বিষয়বস্তু, রচনার ভাষা এবং রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। পুনঃপুনঃ আলোচনা, সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে রচনাগুলি যতদূর সম্ভব নির্ভুল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠে।

১৯৫৬-৫৭ সনে বাণীপুরে দ্বিতীয় সাহিত্য-কর্মশালার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল শিশুভারতী-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপর। ষোলজন লেখক এই কর্মশালায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় মোট ষোলখানা শিশু ও কিশোর-পাঠ্য বই রচিত হইয়াছে। এই বইখানি উহাদের অন্যতম। শিশু ও কিশোর পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সুবোধ্য, সহজ ও সরল ভাষায় বইগুলি লিখিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বাঙলার শিশু ও কিশোর সম্প্রদায় এই বইগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিবে।

সাহিত্য-কর্মশালার পরিচালক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মিগণ যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

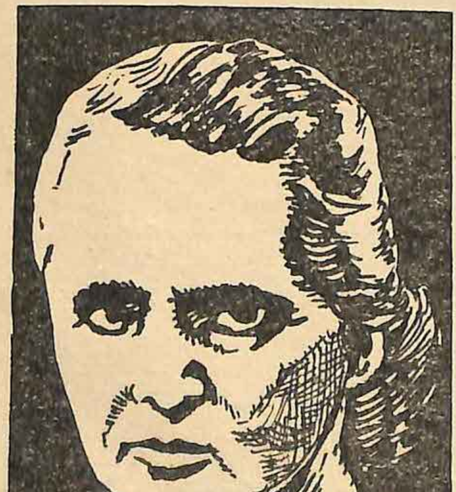
নিখিলরঞ্জন রায়,
সমাজশিক্ষার প্রধান পরিদর্শক,
শিক্ষা-অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ



জগদীশচন্দ্র বসু



মাইকেল ফ্যারাডে



মাদাম মেরী কুরী



মেঘনাদ সাহা

মাইকেল ফ্যারাডে

অনেকদিন আগের কথা। ছোট একটি ছেলে পথে পথে ঘুরে বেড়াত। ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়াল এক দোকানঘরের সামনে। দোকানের মালিক ভাবলেন, ছেলেটা কতদিন বুঝি পেট ভ'রে খেতে পায় নি। তাই তিনি বললেনঃ কি চাই রে খোকা?

ছেলেটি বললেঃ খেতে পরতে পাই নি। একটা কাজ খুঁজছি।

মালিক তো অবাক। বলেনঃ তোকে কি কাজ দেব? এতটুকু ছেলে তুই। তোকে নিলে আমার বইয়ের দোকান চলবে না।

ছেলেটি তবু যায় না। বলেঃ দিন না একটা কাজ। দেখুন আমি পারি কিনা!

কাজ জুটল। সেই বইয়ের দোকানেই। ঘরদোর ঝাঁট দিতে হয়। জুতা পরিষ্কার করতে হয়। এখানে ওখানে যেতে হয়। চিঠি বিলি করে সে। কাগজও বিক্রি করে।

এমনি ক'রে কেটে গেল এক বছর। মালিক তখন ডাকলেন ছেলেটিকে। বললেনঃ তোর কাজে আমি খুশি হয়েছি। তোকে আর একটা কাজ দেব। পারবি তো!

ছেলেটি হ'ল বেজায় খুশি। বললেঃ কি কাজ বলুন।

মালিক কাজ দেখিয়ে দিলেন। বই বাঁধানো হ'ল তার নতুন কাজ। সে বই বাঁধায়। নতুন বইয়ে চামড়া লাগায়। পুরানো বইয়ের ছেঁড়া পাতা ঠিক ক'রে দেয়। আঠা লাগায়।

সে আর কি করে জান? বইগুলি পড়ে। পড়ে আর ভাবে। কোন বইয়ে হয়তো লেখা আছেঃ মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। সে ভাবতে ব'সে গেল। ভেবে ভেবে নিজের মনেই বললঃ তা হ'লে মেঘ না হ'লে কিছুতেই বৃষ্টি হবে না।

আবার একটা বই পড়ল। তাতে লেখা আছেঃ চুম্বক লোহার কাছে এনে রাখলে লোহাটা দৌড়ে যাবে চুম্বকের কাছে। পড়েই ওর মনে হ'লঃ কবে চুম্বক কিনতে পারব!

একদিন সে চুম্বক কিনে আনল। সেটাকে লোহার জিনিসের কাছে এনে দেখে লোহা এসে লাগে চুম্বকের গায়ে। তাকে সরানোই যায় না।

মাইকেলের বয়স বেশি নয়। চোদ্দ-পনের বছরের ছেলেরা কত কি নিয়ে মেতে থাকে। কেউ গান শোনে। কেউ শহর ঘুরে আসে। আবার কেউ যায় মামার বাড়ি। মাইকেল কোথায় যায় জান? সে যায় বক্তৃতা শুনতে।

বক্তৃতা শোনে মাইকেল। খুব ভাল ক'রে শোনে। সে-সব কথা বাড়ি ফিরে এসেই লিখে রাখে। তোমরা যেমন ছবি কেটে এঁটে রাখ খাতায়, আবার ডাক-টিকেট জমিয়ে রাখ আর একটা খাতায়—মাইকেল তেমনি বক্তৃতা লিখে রাখে তার খাতায়। এটা তার বিজ্ঞানের খাতা।

মাইকেলের দেশ ইংল্যান্ড। সেদেশে অনেক কয়লা আছে মাটির তলায়। তাকে কয়লাখনি বলে। সেইসব কয়লাখনির বাতাসে আগুন লেগে যায় চট্ ক'রে। জ্বলে ওঠে দপ ক'রে। নেবাতে পারা যায় না সহজে।

একদিন এর কথাই বলছিলেন বৈজ্ঞানিক ডেভি। তিনি আবিষ্কার করেছেন এক রকম বাতি। সেটা নিয়ে খনির ভিতর গেলে আগুন ধরতে পারে না।

মাইকেল বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে সেই রাতেই কয়েকটি কাগজ নিল সে। তার ওপর সুন্দর ক'রে লিখল। ডেভি যা বলেছেন সব লিখে রাখল। আর ছবি আঁকল পাশে পাশে।

সে তো বই বাঁধাতে জানত। কাগজগুলি বইয়ের মত ক'রে বাঁধাল। তারপর ডেভিকে চিঠি লিখতে বসল। লিখলঃ আমার আরো অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করে। আমায় রাখবেন আপনার কাজে?

লিখে ডেভির কাছে পাঠিয়ে দিল।

চিঠি আর খাতা পেয়ে ডেভি খুব খুশি হলেন। একেবারে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ওদের বাড়িটা ভাঙ্গা। কেউ তো কোনদিন সেখানে গাড়ি নিয়ে আসে না।

মাইকেলকে নিতে এসেছে গাড়ি!

মাইকেল বইয়ের দোকান ছেড়ে এল তার নতুন মনিব ডেভির কাছে। কাজটা প্রায় একই রকমের। ঝাড়পোছ করে। ওষুধপত্র ঢালাঢালি করে। কাচের শিশি-বোতল ধুয়ে রাখে। মাঝে মাঝে ডেভি যান অন্য দেশে। তাঁর চাকর হিসেবে সে সঙ্গে যায়।

রয়াল ইনস্টিটুশনে নানারকমের জিনিসপত্র এসেছে। তার মধ্যে এক রকমের পাকানো তার রয়েছে। মাইকেল একটা চুম্বক যেই এনে ফেলেছে সেই পাকানো তারের মাঝখানে, কি অবাক কাণ্ড ঘটল—বিদ্যুৎ-প্রবাহ বইতে থাকল তার ভিতর দিয়ে।

এমনিভাবে মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুৎ তৈরি করার সহজ উপায় বা'র করল। তোমরা তো রোজ দেখতে পাও—বিদ্যুৎ দিয়ে বাতি জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, আলোয় ভ'রে যাচ্ছে বড় বড় রাস্তা, সিনেমা চলছে, বেতারেও লাগছে বিদ্যুৎ।

মাইকেলের বুদ্ধি থেকেই এসব বার হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র বসু

"গল্প বল।"

কাল মস্ত এক জোয়ান চলেছে রাস্তা দিয়ে। তার কাঁধে ব'সে জগদীশ বলে—"গল্প বল।"

গল্প শুরু হয়। কে বলে জান? যে লোকটা তাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল পাঠশালায়।

"পালকি চলেছে। বেহারারা হাঁকছেঃ হুম্‌হাম্‌, হুম্‌হাম্‌। ভিতরে বর আর বউ। বউয়ের বাবা বড়লোক। অনেক গয়না দিয়েছেন মেয়েকে। গয়না আর লাল বেনারসী শাড়ি প'রে বউ চলেছে পালকি ক'রে।

"আসবার সময় বাবা-মাকে ছেড়ে আসতে চায় নি। মা কত বুঝিয়েছেন, তবু নড়তে চায় নি সে। তখন বাবা স'রে এসেছেন। তারপর মা বকেছেন। তখন রাগ ক'রে মেয়ে উঠে এসেছে। আড়ি করেছে মা-বাবার সঙ্গে।

মা বকেছে, বাবা বকেছে
তাই ক'রে সে আড়ি
যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি।"

গল্প বলতে বলতে সে একটু থামে। কাঁধের ওপর খোকা নড়েচড়ে বসে। কোঁকড়ান চুলগুলি ঠিক ক'রে নেয়।

আবার গল্প শুরু হয়—

"হঠাৎ হা রে রে রে ক'রে—
ডাক ছাড়ল কে রে!

"শুধু কি ডাক ছাড়ল? না, লাঠিও উঠাল। শুধু লাঠি নয়; সোঁটা, সঙিন, বল্লম। এসেছে এক বড় ডাকাতদল। তাদের হাতেই পড়ল বরযাত্রীরা। বেজায় মার খেল। কারুর হাত ভাঙ্গল। কারুর পায়ে পড়ল লাঠি।

"ডাকাতরা কেড়েকুড়ে নিল গয়নাগাঁটি। টেনে, খুলে, খাবলে, ছিঁড়ে নিল সোনাদানা, টাকাকড়ি।"

প্রতিদিন হাকিমের ছেলেকে এমনি নানা গল্প শুনায় মস্ত জোয়ান। তার কাঁধে চ'ড়ে খোকা পাঠশালা যায়। আর চোখমুখ ঘুরিয়ে, নানারকম কায়দা ক'রে এসব গল্প শোনায় তাকে। বানানো গল্প নয়, তার নিজের কথা—এসব কাণ্ড সে নিজেই করেছে।

প্রতিদিন এসব কথা হয় তা কি হাকিম জানেন? জানেন আর না! তিনিই তো ওকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। ছাড়া পেয়ে ডাকাত এসে হাজির হ'ল হাকিমের কাছে। বললঃ হুজুর, ছাড়া তো পেলাম। কোথাও কি আর কাজ জুটবে? আপনারই একটা কাজে লাগিয়ে দেন না।

জেল-ফেরত ডাকাত কাজ পেল। হাকিমের ছেলে জগদীশচন্দ্রকে দেখাশুনা করতে হবে। তাকে নিয়ে যেতে হবে পাঠশালায়। ফিরিয়ে আনতে হবে বাড়ি।

এই ডাকাতসর্দার হ'ল জগদীশচন্দ্রের প্রথম সঙ্গী। এর কাছে গল্প শুনে তার মনে কি হ'ত জান? ভয়ডর করতে নেই, কাজ নিয়ে ছাড়তে তা নেই, হেরে গেলে থামতে নেই।

ছেলেবেলা কাটল ফরিদপুরে। সেখানে কত গাছ, লতা, পাতা দেখেছে জগদীশ। দেখেছে লতার কাণ্ড। গাছের সঙ্গে ভাব জমিয়ে সে তার গায়ে এসে বসেছে। তারপর তাকেই দুমড়ে, মুচড়ে কাহিল ক'রে দিয়েছে। জগদীশ ভাবত কেন এসব হয়।

তারপর বাবার কাজ পড়ল বর্ধমানে। সেখানেই চললেন তিনি। জগদীশও চলল সঙ্গে সঙ্গে। বর্ধমানে তাদের বাড়ির কাছে ছিল এক কাঁসার কারখানা। জগদীশ দেখত কাঁসার কারখানার কাজ। কাঁসা গালিয়ে ছাঁচে ফেলে থালা বাটি, ঘড়া, ঘটি—কত জিনিস তৈরি হয়। এসব দেখে জগদীশ ভাবত আমি বড় হয়ে অনেক জিনিস তৈরি করব।

বড় হলেন জগদীশ। বড় বিদ্যালয়ে পড়লেন কলকাতায় এসে। ছেলেবেলার ভাবনাগুলি কিন্তু তাঁর মনে মনেই আছে। তোমাদের মনে তো কথা জাগে। কত কি তোমরা ভাব। সব কথা কি মনে রাখ? ভুলে যাও কত কথা। জগদীশ কিন্তু ভুললেন না।

একদিন তাঁর মনে হ'ল, আমাদের যেমন প্রাণ আছে, গাছেরও তেমন প্রাণ আছে। গাছ তো কোনদিন কথা কয় না। তা হ'লে কি ক'রে বোঝা যায় তার প্রাণ আছে কিনা! জগদীশচন্দ্র খুব ভাবতে লাগলেন। অনেক দিন রাত্রে ঘুমাতেন না। এসে গাছের পাশে দাঁড়াতেন। শুনতেন তারা কথা বলে কিনা!

একদিন শুনতে পেলেন, গাছ কথা বললো! গাছ তো মানুষের ভাষা জানে না। তাদের নিজেদের ভাষায় বলাবলি করে। পদ্মফুলকে পদ্মগাছ বলে, 'রাত্রি হয়েছে।' পদ্মফুল ফুটে ওঠে। লজ্জাবতী লতার কাছে যদি কেউ হাত নিয়ে আসে, অমনি সে ব'লে দেয় পাতাদের। পাতারা গুটিয়ে ফেলে নিজেদের। বনচাঁড়াল গাছের কাণ্ডও ব'সে ব'সে দেখলেন জগদীশ। মানুষ কাছে এলে কেমন জড়সড় হয়ে যায়।

গাছের কথা বুঝতে পারলেন তিনি। আর সবাইকে কি ক'রে বুঝানো যায়? নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করালেন দেশী কারিগর-ছুতারদের দিয়ে। তা লাগালেন গাছের গায়ে। গাছ তার নিজের ভাষায় অনেক কথা বললো। সেই নতুন যন্ত্রে তার লেখা পড়ল। তাঁর সাধনায় পৃথিবীর সবাই মুগ্ধ হ'ল। তাঁকে বিলাতের রয়াল সোসাইটির সভ্য ক'রে নেওয়া হ'ল।

জগদীশচন্দ্র এমনিভাবে তরুলতার গোপন কথা জানতে পারলেন। তাই সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে গেছে। তাঁর গড়া "বসু বিজ্ঞানমন্দির"-এ গাছপালার প্রাণের সাড়ার কথা জানতে আসে কত মানুষ। শুনতে আসে তাঁর আবিষ্কারের কথা।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সাধনার কথা তা হ'লে কি জানতে পেরেছ? আমাদের দেশের একজন বড় লেখক সে-কথা লিখেছেন একটি কবিতায়। শুনবে? আচ্ছা বলছিঃ

জড়ের জীবনে কি গোপন কথা,
বিটপীর কানে কি যে কহে লতা,
কেন হাসে ফুল,
পুলকে আকুল,
জানো সে নিগূঢ় বাণী।
ঋষিদের বাণী নবীন ছন্দে,
তুমিই আনিলে মুরজ মন্দ্রে,
এক প্রাণ খেলে বিশ্ব নিখিলে
এক সুরে বাঁধা প্রাণী॥

মাদাম মেরী কুরী

ছোট্ট মেয়ে মেরী। খুব ছোট। তবু সে অনেক কাজ জানে। তার বাবা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাবা বিদ্যালয় থেকে ফিরে আসেন বিকাল বেলা। তখন মেরী বাবার যত শিশি-বোতল আছে, তা ধুয়ে দেয়। তারপর খুব ভাল ক'রে গুছিয়ে রাখে।

তাদের দেশ হ'ল পোল্যান্ড। ইউরোপের একটা দেশ এই পোল্যান্ড। পোল্যান্ড-বাসীরা তখনও স্বাধীন হ'তে পারে নি। তাই নিজেদের ইচ্ছে মতো কিছু করতে পারে না। এমনকি তাদের বইগুলি সব রুশ ভাষায় লেখা।

মেরীর বাবার তাতে খুব রাগ হয়। মেরীরও রাগ হয়। বাবা নিজের পয়সা দিয়ে নানান যন্ত্রপাতি কেনেন। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সেগুলি দেখান। বুঝিয়ে দেন তা দিয়ে কি কাজ হ'তে পারে। মেরীর দেখতে বেশ মজা লাগে। বলেঃ বাবা, আমি তোমার সব জিনিস ঠিকঠাক ক'রে রাখব।

বাবা খুশি হলেন। বলেনঃ মেরী, তোমার খুব বিদ্যা হবে। তুমি মস্ত বড় হবে।

মেরী বড় হয়ে উঠল। লম্বা হ'ল। বয়সে বড় হ'ল। পড়াশুনা করতে চলল ফরাসীদেশে।

ফরাসীদেশে তো এল। কিন্তু সেখানে যে তার কেউ নেই। তাই খুব গরিবরা যেখানে থাকে, মেরী থাকতে পেল সেখানে। তখন ছিল খুব শীত। মেরীর গায়ে গরম জামা নেই। সে শীতে কাঁপে ঠকঠক ক'রে। কোন কোন দিন খেতেও পায় না। এমনিভাবে মেরীর দিন কাটে।

মেরীর দুঃখ একদিন কমলো। তাকে খুব ভালবাসতেন তার শিক্ষক পিরী। বিয়েও করেছিলেন তার গুণ দেখে।

তাদের যন্ত্রপাতি নেই। বইপত্র মেলে না। জোটে না পয়সাকড়ি। তা হ'লে তারা কি ক'রে কাজ করবে? একটা ঘর পেল অনেক খুঁজে খুঁজে। সেটা আবার ভাঙ্গা ঘর। সেখানেই মেরী আর পিরী একসঙ্গে কাজ করতে থাকে।

কাজ করতে করতে একদিন একটা নতুন জিনিস বার করল মেরী আর পিরী। তার নাম রেডিয়াম। এটি খুব দামী ধাতু। রেডিয়ামের গা থেকে ভারী সুন্দর আলো বের হয়। তা দিয়ে অনেক কাজও হয়। অনেক অসুখ আগে সারত না। রেডিয়াম দিয়ে তা সারান গেল। রেডিয়ামের আলো কিন্তু খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না।

রেডিয়াম আবিষ্কার করার জন্য মেরী আর পিরী পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীর সম্মান নোবেল পুরস্কার পেল।

মহেন্দ্রলাল সরকার

বৌবাজারে এক ডাক্তারবাড়ি এসেছে এক রোগী। রোগী ছেলেমানুষ। কিন্তু তার রোগটা অনেক দিনের। সে কিছুতেই সেরে উঠছে না। সবাই বলছে সারবে না।

ছেলের বাবা ডাক্তারকে বলছেনঃ ডাক্তার বাবু, ওকে আপনি সারিয়ে দিন। আর কেউ ভরসা দিল না। ও যে মরতে বসেছে!

ডাক্তার এতক্ষণে কথা বললেনঃ মহেন সরকারের রোগী মরে না।

এমন ডাক্তার ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার। ডাক্তার তো দেশে অনেক। তাঁদের অনেকে খুব নামও করেছেন। কিন্তু মহেন্দ্রলালের মত নাম হয় নি কারুর।

কেন জান?

মহেন্দ্রলাল ডাক্তারী করতে করতে ভাবতেনঃ এত বড় আমাদের দেশ—অসংখ্য লোকের বাস—তাদের সুখী করা যায় কি ক'রে?—রোগ হ'লে তো আমি চিকিৎসা করি—কিন্তু রোগ হবার আগেই যদি ভাল খাবার দাবার ব্যবস্থা করা যায়—যদি ভাল ক'রে দেওয়া যায় তাদের ঘরবাড়ি—জীবনের সব-কিছুকে ভাল করলে তো তাদের দুঃখ ঘুচবে।

ভেবে ভেবে দেখেন মহেন্দ্রলাল।

এলোপ্যাথ ডাক্তার, নতুন ক'রে শিখতে থাকেন হোমিওপ্যাথি।

তাঁর আরও কত কি মনে হয়। অন্য দেশগুলি কি ক'রে বড় হয়েছে? বিজ্ঞান শিখে বড় হয়েছে। মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞান শেখানোর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। নাম দিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান-সভা। সারা ভারতের বিজ্ঞানী ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভা। নিজের বাড়ি দিয়ে দিলেন। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক বই এনেছিলেন—সব দিয়ে দিলেন। টাকাকড়ি যা ছিল তা দিলেন।

বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা এলেন ভারতীয় বিজ্ঞান-সভায়। কেউ দেশী, কেউ বিদেশী। কয়েকজনের নাম তো তোমরা ভাল ক'রেই জান। যেমন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তা ছাড়া এলেন বি এল চৌধুরী, ফাদার লাফন্ট। হাতেকলমে বিজ্ঞানের পরীক্ষা ক'রে দেখালেন তাঁরা।

এমনিভাবে গ'ড়ে উঠল দেশের নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান। এখানে এসে তরুণ বয়সে বিজ্ঞানের কথা শুনতেন মেঘনাদ সাহা। এখানেই কাজ ক'রে চন্দ্রশেখর ভেংকট রমণ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কৃষ্ণান হ'তে পেরেছেন রয়াল সোসাইটির সভ্য।

বিরাট প্রতিষ্ঠান করেছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। বিজ্ঞান নিয়ে আমরা যা কিছু চর্চা করছি সব শুরু হয়েছে এখানে, ভারতীয় বিজ্ঞান-সভায়। দেশ স্বাধীন হবার পর বৌবাজারের সে বাড়ির বিজ্ঞান-সভা উঠে এসেছে নতুন বাড়ি যাদবপুরে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, রেল স্টেশন থেকে কিছু দূরে। একদিন এসো, দেখতে পাবে, রাতদিন সেই প্রতিষ্ঠানে জ্বলছে আলো। আর, বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা চলছে সেখানে।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

ছোট ছেলে অ্যালবার্ট। পাঁচ বছর বয়স তার। বাবা একদিন তাকে মজার এক জিনিস দেখালেন। তোমরাও হয়তো তা দেখেছ। গোল ঘড়ির মত। শুধু একটা কাঁটা। তার মাথায় লেখা "উত্তর"।

অ্যালবার্ট জিনিসটাকে যেদিকে রাখে কাঁটাটা এসে হাজির হয় আকাশের উত্তর দিকে, যেদিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালে সূর্যকে ভোরবেলা দেখতে পাবে ডান দিকে। সন্ধ্যাবেলা দেখতে পাবে বাঁ দিকে সূর্য ডুবে যাচ্ছে।

অ্যালবার্ট উঁচুতে তুলে ধরে জিনিসটাকে। তারপর নিচুতে নামায়। হেলিয়ে দুলিয়ে জব্দ করতে চায়। কিন্তু কাঁটার ভুল হবার যো নেই। ঐ এক দিকে ঝুঁকে আছে সেটা। অ্যালবার্ট অবাক মানে। নাড়ানো হ'লে সব জিনিস নড়ে। এক জায়গায় রেখে দিলে সেখানেই থেকে যায়। এতদিন তো এটাই সে দেখেছে।

চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর কি ভেবে তাড়াতাড়ি ঘরটার দরজা-জানালা সব বন্ধ করল। আর সেই অন্ধকার ঘরে জিনিসটাকে লুকিয়ে রাখল এক জায়গায়। জিনিসটা যেন বুঝতে না পারে কোথায় আছে সে। রাত্রিবেলা আমরা যদি অন্য কোথাও গিয়ে শুই, ঘুম ভাঙ্গলে গোলমাল ক'রে ফেলি। ভুলে যাই দরজা কোন্ দিকে। জিনিসটাকে তেমনি ক'রে জব্দ করতে চাইল অ্যালবার্ট।

তারপর দরজা খুলল। ঘর আলো ক'রে দিল। অন্ধকার পালিয়ে গেল। অ্যালবার্ট এসে জিনিসটার দিকে চোখ মেলে তাকাল। কই না! সে ঠিক কাঁটা ঘুরিয়ে রেখেছে উত্তর দিকে।

অ্যালবার্টের তখন মনে হ'ল, নিশ্চয় কোন লুকোনো ব্যাপার আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু হচ্ছে। জিনিসটার সঙ্গে আর কারুর ভাব আছে। সে লুকোচুরি খেলছে। তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। ধরতেও পারা গেল না। কিন্তু সে নিশ্চয় আছে।

বয়স বেড়েছে অ্যালবার্টের। বাবা-মা ওকে রেখে গেলেন মিউনিক শহরে পড়াশুনা করার জন্য। পড়ায় ওর মন বসে না যে। মনের ভিতর হা হা করে। দুঃখ লাগে। মা-বাবা তো কাছে নেই। ভোরের হাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেলে মনে হয়, মা বুঝি মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গেলেন। তখন ওর মার কথা খুব মনে পড়ে।

সেই যে লুকিয়ে থাকা বন্ধু, তার কথা ভাবতে ভাল লাগে। এখানেও যদি গোল ঘাড়ির মত জিনিসটা এনে দেখা যায়! তা হ'লে সে কি ঠিক বুদ্ধি বাতলে দেবে? কানে কানে নয়তো মনে মনে ব'লে দেবেঃ ঐ তো উত্তর দিক। কাঁটা ঘুরিয়ে নাও ঐ দিকে।

অ্যালবার্ট ভাবলঃ তা হ'লে আমিও কাঁটা ঘুরিয়ে দেব আমার মা-বাবার দিকে!

কাঁটা ঘুরে গেল।

তখন তার পরীক্ষা চলছে। সে দুষ্টুমি ক'রে পরীক্ষায় কোনদিন উঠে এল। কোনদিন ব'সেই রইল। কিন্তু কিছু লিখল না ঠিক ক'রে।

পরীক্ষার ফল কি হ'ল তা তো বুঝতেই পারছ!

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডেকে বললেনঃ কি হ'ল গো তোমার? অ্যালবার্ট বললঃ শরীরটা সুবিধার নয়। একা প'ড়ে আছি। দেখার তো কেউ নেই।

তিনি বললেনঃ তা হ'লে কি করতে চাও?

অ্যালবার্ট চুপচাপ। তার কাঁটা যে ঘুরে গেছে ঠিক মিলান শহরের দিকে। সেখানে তার মা-বাবা আছেন।

প্রধান শিক্ষক বুঝলেন। বললেনঃ যাও, বাড়ি যাও। বাবা-মার সঙ্গে গিয়ে থাক।

বাবা-মা থাকেন মিলান শহরে। ইতালী দেশে। অ্যালবার্ট সেখানে হাজির হ'ল। সেখানে অ্যালবার্টের চেহারাই বদলে গেল। কি ফুর্তি! কেমন মজা! শুধু মজা নয়। পড়াশুনাও তার চলল বেশ ভালভাবে। আর নিয়মিত।

একদিন তার মনে হয়, আচ্ছা, এই যে আমি মিলান শহরে আছি। কেমন মজায় দিন কেটে যাচ্ছে। আর মিউনিকে? দিনই কাটতে চাইত না। তা হ'লে দু'টো দিন কি সমান নয়?

বড় হয়ে অ্যালবার্টের ভাবনা বাড়ল। কি ক'রে আকাশে এল গ্রহ-তারা? পৃথিবী, সূর্য এসব কেন জন্মেছে? কত দিন আগে? কেমনভাবে ছিল আগে? পরেই বা কেমন হবে?

* * * *

অ্যালবার্ট জানলেন জিনিসের মধ্যে শক্তি আছে। সূর্যের মধ্যে শক্তি আছে। আলো হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে। তাই সূর্য ছোট হয়ে যাচ্ছে। যেই সূর্য ছোট হয়ে গেল, তার টান ক'মে গেল। তার কাছ থেকে স'রে আসছে পৃথিবী।

বার্লিন শহরে তাঁর দেশ; জার্মানীর লোকজনেরা তাঁকে একটা বাড়ি উপহার দিলেন। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা তাঁকে সম্মান জানালেন। নোবেল পুরস্কার পেলেন তিনি।

তারপর। সুখের পর এল দুঃখ। একদিন জার্মানী থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দিলে জার্মানীর নতুন পরিচালক হিটলার।

তিনি তাঁর বার্লিনের সুন্দর বাড়িটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশ নেই। পথে পথে চলতে হয়। কিন্তু নতুন কথা জানার শেষ নেই।

পৃথিবী সূর্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। শক্তি তাকে ঠেলে বার করেছে। সেই শক্তি লুকিয়ে আছে পৃথিবীর খুব ছোট জিনিসে। টুকরো ধাতুর গুঁড়োতেও আছে। তা যদি ভেঙ্গে ফেলি? তার ভিতর পাব শক্তিকে। সে অনেক কিছু ওলট পালট ক'রে দেবে।

এসব কথা তিনি লিখলেন আমেরিকার সভাপতি রুজভেল্টকে। রুজভেল্ট বললেনঃ আসুন, আমেরিকায় ঘর পাতুন।

নতুন ঘর বাঁধলেন অ্যালবার্ট আমেরিকায়। সেখানে একদিন দেখলাম—সবচেয়ে বড় শহর নিউ ইয়র্কের নদীর ধারে, গির্জাঘরের মস্ত বড় মন্দিরে কি এক কাণ্ড হচ্ছে। বড় বড় পাথরের উপর নাম খোদাই করা হচ্ছে। ছ'শো জন বড় মানুষের নাম। কোন পাথরে তাঁদের নাম, যাঁরা ইতিহাসের পুরানো গল্প জানেন। কোনটায় তাঁদের নাম, যাঁরা খুব ভাল কবিতা লিখেছেন।

একটা পাথরে দেখা গেল চৌদ্দ জনের নাম। তাঁরা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ক'রে পৃথিবীর মহৎ উপকার করেছেন। তার ভিতর জ্বলজ্বল করছে এঁর নাম—অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

বীরবল সহানী

এক রাতে বেজায় হুলুস্থুল। বাড়ির সবাই ব্যস্ত। লণ্ঠন হাতে সবাই এধার ওধার ঘুরছে। ব্যাপার কি? না, বাড়ির ছেলেমেয়েরা কোন্ সকাল থেকে বাড়ি ছাড়া। আর ফেরার নাম নেই।

বাড়ির কর্তা, ওদের বাবা, বললেনঃ কি হ'ল! কে নিয়ে গেছে ওদের?

মা ভয়ে ভয়ে বলেনঃ নিয়ে গেছে বীরবল।

বাবা বলেনঃ কি করতে গেছে জান?

মা বলেনঃ জানি না, তবে সেজ ছেলে বলছিল কি আনতে যাবে।

ভাইবোনের দল এমন সময় পায়ে পায়ে ফিরল। তাদের চোখ ছলছল করছে। সারা দিনে খাওয়া জোটে নি। সেজ ভাই, বীরবল এসে তাল দিয়েছিলঃ চল একটা মজা ক'রে আসি।

সবাই দল পাকিয়ে মজা করতে গিয়েছিল। সূর্য তখনও ওঠে নি।

বাড়ি ফিরতেই বাবা ধরলেন। বললেনঃ দাঁড়াও, কোথায় ছিলে সারাদিন?

সকলের ভাবনাঃ কি হয়, কি হয়!

বীরবল ব'লে উঠলঃ আমরা পাহাড়ী ঝর্নায় গিয়েছিলাম, কাঁকড়া ধরতে।

ব'লে একটু থেমে কি ভাবল। তারপর বাবাকে বললঃ আমাদের তুমি মারতে পাবে না কিন্তু। তুমিও তো ছেলেবেলায় কত দূর দূর পথ হেঁটে চ'লে যেতে!

বাবা মারতে পারলেন না। সত্যি কথা বলেছে বীরবল। ছেলেবেলায় একশো পঞ্চাশ মাইল পথ হেঁটেছিলেন বাবা। ছেলেমেয়েরা সেসব কথা জানে। বীরবল জানে সবচেয়ে ভাল ক'রে।

বীরবল কত কাণ্ড করে! ওরা ভাইবোনেরা মিলে একটা বাগান বানিয়েছিল। বাগানে ফুল ধরেছে। ফলও ধরছে। ভাইবোনেরা সেসব ফুল মাথায় গুঁজবে। ফল খাবে চেখে চেখে।

বাবা এসে বলেনঃ আমায় বদলী ক'রে দিয়েছে।

বীরবল বললেঃ তোমাকে বদলী করেছে। তুমি যাও।

বাবা বললেনঃ তোমাদেরও নিয়ে যেতে হবে। এখানের বাড়িই ছেড়ে দিতে হবে।

বীরবল বললেঃ সে কি ক'রে হয়! আমাদের এখানে কত কাজ। আমাদের বাগান দেখতে হবে না?

বাবা বললেনঃ কেন, সামনের বাড়ির কাকা-কাকিমা বাগান দেখবেন।

পরের দিন। চুপি চুপি উঠল ওরা! কাউকে কিছু জানাল না। গাছগুলির শিকড় কেটে দিল, বড় কাঁচি দিয়ে। গাছগুলি নুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলা বাবা এসে দেখলেন। সামনের বাড়ির কাকা-কাকিমা দেখলেন। গাছের গোড়ায় জল ঢাললেন তাঁরা। আরো নুয়ে পড়ল সেগুলি।

বীরবল এসে মার পাশে দাঁড়াল। বললঃ আমরা তো চ'লে যাব। তাই ওদের দুঃখ হয়েছে। না, মা?

এক সময় বীরবল পাহাড়ের কাছে ছিল কিছুদিন। একটু দূরে জোজিলা পাহাড়। পাথরের তলায় কেউ তো খুঁজে দেখে না কি আছে। বীরবল খুঁজল পাথরের তলায়। কোন্ আদ্দিকালের বুড়ো শ্যাওলার শুকনো পাতা। ওর সেগুলি জমাতে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছে করে জানতে, এরা কতকাল ধ'রে আছে।

গাছ আর পাথর। এরা বীরবলের বন্ধু। ছুটি পেলেই ছুটে যায় গাছের কাছে; পাথরের কাছে। এদের সঙ্গে মিতালি ক'রে সময় কাটিয়ে দেয়।

দুষ্টু বীরবল বড় হয়ে উঠল। বিলাত গেল পড়াশুনা করতে। সঙ্গে নিয়ে গেল বুড়ো শ্যাওলা আর গাছের জমাট বাঁধা রস। তারা যে তার বন্ধু। কেমন বন্ধু শুনবে?

বীরবলকে সাহেব গুরুরা ভর্তি করতে চান নি। বীরবল থলে খুলে বার করল জমাট বাঁধা রস। তারপর বললঃ কতদিন ধ'রে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। এসব যোগাড় করেছি। আমি যে জানতে চাই এসব গাছ-পাথরের কথা।

সাহেব গুরু অবাক। এত কষ্ট করেছে কুড়ি বছরের ছেলে। এত ভাব করেছে গাছ আর পাথরের সঙ্গে। বীরবলকে তবে ত ভর্তি ক'রে নিতে হয়!

তোমরা কি বলতে পার একটা গাছের বয়স কত? পার না তো? বীরবল এদের বয়স কত বলতে পারতেন। এমনকি গাছ শক্ত হয়ে পাথর হয়ে গেলেও তিনি বলতেন তাদের কথা। গাছপালার বিষয় কত কথা তিনি জানলেন। সবাই যাতে এসব জানতে পারে তাই লক্ষ্মৌ শহরে তিনি গড়লেন মস্ত বড় বিজ্ঞান মন্দির। তাঁর নামেই সেটিকে বলা হয়ঃ বীরবল সহানী গাছপালার বিজ্ঞান-মন্দির।

বড় বিজ্ঞানী হলেন বীরবল। দেশে দেশে তাঁর অনেক নাম হ'ল। রয়াল সোসাইটির সভ্যপদের সম্মান পেলেন তিনি।

কিন্তু ছেলেমি কমে নি এতটুকু! সেদিনও তিনি বিদেশে গিয়ে এক মজার কাণ্ড করলেন। ভারতের বিজ্ঞান প্রতিনিধি হয়ে তিনি জার্মানী গেছেন। সেখানে ফুটপাথে কিনে ফেললেন একটা জিনিস। কি সেটা? না, একটা কলের বাঁদর।

মেঘনাদ সাহা

গ্রামের পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নামতা পড়ছে। কিছুক্ষণ প'ড়ে তারা লিখতে বসল।

একজনের হাতের লেখা ভারী সুন্দর। তার নাম মেঘনাদ। প্রায় সময়ই তাকে খাতা লিখতে হয়। তাদের একটা মুদিখানা দোকান আছে। সেই দোকানের খাতা সে লেখে। দোকানেও বসে মাঝে মাঝে। জিনিসপত্র ওজন করে। বিক্রি করে। ফর্দ মিলিয়ে খদ্দেরদের বিদায় করে।

শিক্ষকরা তাকে খুব ভালবাসেন। বলেনঃ তোর পড়া বন্ধ করিস না। তোকে অনেক বেশি পড়তে হবে।

বাড়িতে বাবা বলেন অন্য কথাঃ মেঘনাদ তোর পড়া শেষ হবে কবে?

একদিন মেঘনাদের বড়দা জয়নাথ বাড়ি এলেন। এসে বললেনঃ বাবা, সিমুলিয়া গ্রামে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। মেঘনাদের পড়ার ব্যবস্থা করেছি সেখানে। ওখানে ডাক্তার অনন্তকুমার দাস মশায়ের বাড়িতে থাকবে। আর পড়াশুনা ক'রে বড় হবে।

কথা শুনেই বাবা গেলেন চ'টে। বললেনঃ ওসব হবে না। এখানেই থাকবে মেঘনাদ। দোকানটা চালাতে হবে ওকে।

অনেক বুঝিয়ে বলল জয়নাথ। শেষটায় বাবার মত হ'ল। বাবা রাজী হলেন।

দশ বছর বয়সে মেঘনাদ চলল সিমুলিয়া। শেওড়াতলী গ্রাম ছেড়ে সিমুলিয়া চলল। সেখানে তার পড়াশুনার খুব ভাল ফল হ'ল। বৃত্তি পেল সে। আর তার পড়ার জন্য মাইনা দিতে হবে না। সে যেখানে ইচ্ছা ভর্তি হ'তে পারে। যে-কোন বিদ্যালয়ে।

মেঘনাদ ভর্তি হ'ল ঢাকার বিদ্যালয়ে।

তখন ঢাকায় খুব গোলমাল চলছিল। সাহেবরা বাঙলাদেশের কিছুটা জায়গা আর একটা দেশের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইছিল। দেশের লোক তা কিছুতেই হ'তে দেবে না। এই নিয়ে তুমুল বিরোধ। দেশের লাট ফুলার সাহেব তখন ঢাকা এসেছেন।

ছেলের দল বিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ফুলার সাহেবকে বললঃ

ফুলার সাহেব হও উধাও
ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যাও॥

দলে মেঘনাদও ছিল। এজন্য তার নাম কেটে বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। বৃত্তি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

মেঘনাদ তখন ভর্তি হ'ল কিশোর জুবিলি বিদ্যালয়ে।

অনেক বাধা বিপত্তি পার হলেন মেঘনাদ। বড় হয়ে পড়তে পেলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আর জগদীশচন্দ্রের কাছে। তাঁর সঙ্গে পড়তেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিল-রঞ্জন সেন, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী। এ'রা সবাই আজ বড় বিজ্ঞানী।

মেঘনাদ কি কি করলেন তা শুনবে? এই যে এ বছর ৯ই চৈত্র থেকে নতুন ভারতীয় বছর শুরু হ'ল, তা মেঘনাদের বুদ্ধি অনুসারে।

দামোদর নদে বাঁধ বাঁধা হয়েছে শুনেছ তো! নদীতে বাঁধ বাঁধার উপায় মেঘনাদ ভেবে বার করেছেন।

অনেক নতুন বিষয় আমাদের তিনি শিখিয়েছেন। কত দূরে সূর্য, কত বড় তারাগুলি, তাদের ভিতর কি আছে, সূর্যের আর তারার আলোর রং দেখে তা তিনি বুঝতে পারতেন। রয়াল সোসাইটি তাই তাঁকে সভ্য ক'রে সম্মান দিয়েছেন।

তাঁর ছেলেবেলায় কিশোরীলাল জুবিলি বিদ্যালয়ে তাঁকে খুব উৎসাহ দিতেন শিক্ষক মহাশয়েরা। একজন শিক্ষক ছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনি আকাশের তারাগুলির কোন্‌টা কোথায় থাকে তা গল্প ক'রে শোনাতেন মেঘনাদকে।

তাঁর গুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনেক ছাত্রকে বিজ্ঞান শেখাতেন। মেঘনাদও তেমন অনেক ছাত্রকে শেখাতেন। বিজ্ঞান চর্চায় প্রচুর উৎসাহ দিতেন। তাই রাতদিন খেটে তিনি নতুন ক'রে গ'ড়ে তুললেন ভারতীয় বিজ্ঞান-সভা। প্রতিষ্ঠা করলেন অণু পরমাণুর জ্ঞান-মন্দির।

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ তাঁর নাম অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা।

ভাগ্যিস তাঁকে মুদির দোকান থেকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর বড়দা জয়নাথ।

পবসমু-৫৭/৮-৫০৮৯এফ-৫,২৫০

सत्यमेव जयते